গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৩ বর্ষ ১৯ সংখ্যা ২৯ জানুয়ারি - ৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ www.ganadabi.com আট পাতা মূল্য ঃ ২ টাকা

কৃষকদের ট্রাক্টর প্যারেড
তৈরি হল আন্দোলনের নতুন অধ্যায়

২৬ জানুয়ারি লক্ষ লক্ষ কৃষক ট্রাক্টর নিয়ে দিল্লির রাস্তায় কৃষক-প্রজাতন্ত্র পালন করলেন। কয়েক লক্ষ ট্রাক্টর এ দিন দখল নিয়ে নিল দিল্লি ঘিরে থাকা রাস্তাগুলির। অবরুদ্ধ হয়ে পড়ল দিল্লি। দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের সেনা কুচকাওয়াজের থেকেও দেশের মানুষের অনেক বেশি আগ্রহ তৈরি করল এই ট্রাক্টর প্যারেড। রাস্তার দু'ধারে অসংখ্য মানুষ কোথাও ফুল ছড়িয়ে, কোথাও হর্ষধ্বনি করে সংহতি জানালেন কৃষকদের।

পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী এ দিন সিংঘু, টিকরি, গাজিপুর প্রভৃতি দিল্লি সীমান্তের কৃষক অবস্থানগুলি থেকে ট্রাক্টর মিছিল শুরু হয়। প্রায় সারা দিন ধরে চলে এই ট্রাক্টর প্যারেড।

এই দিনটি ছিল আন্দোলনের ৬২তম দিন। এই দিনটি ঘিরে আন্দোলন কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক দিন ধরে অপেক্ষা করছিলেন কৃষকরা, গড়ে তুলছিলেন প্রস্তুতি। যেমন সিংঘু, টিকরি সহ প্রত্যেকটি অবস্থানে, তেমনই গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিয়ে বৈঠক করে কৃষি-আইনের মারাত্মক দিকগুলি তুলে ধরছিলেন সংযুক্ত কিসান মঞ্চের নেতারা, যার অন্যতম শরিক এআইকেকেএমএস। তাঁরা আহ্বান জানাচ্ছিলেন ২৬ জানুয়ারি ট্রাক্টর নিয়ে মিছিলে যোগ দেওয়ার জন্য। এ দিনের বিশাল ট্রাক্টর প্যারেড সেই ঐকান্তিক প্রস্তুতিরই ফল। গভীর আবেগে বিভিন্ন রাজ্য থেকে এ দিন হাজার হাজার কৃষক মিছিলে যোগ দেন। এই প্যারেড আন্দোলনে যেমন এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে তেমনই কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের উপরও দাবি মেনে নেওয়ার জন্য বিরাট চাপ তৈরি করেছে। অনেকেই বলছেন, আন্দোলন যে বিরাট, বিস্তৃত আকার ধারণ করেছে তাতে সরকারের এখন আর দাবি না মেনে উপায় নেই।

২৬ জানুয়ারি দিল্লির পথে লাখো ট্রাক্টর

দীর্ঘ দু'মাস ধরে কৃষকদের দাবি মানার ক্ষেত্রে যে টালবাহানা

সাতের পাতায় দেখুন

নেতাজির উত্তরাধিকার বহনের অঙ্গীকার

মহান বিপ্লবী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তরাধিকারকে বহন করব আমরা, তাঁর অপূরিত স্বপ্ন পূরণের যুগোপযোগী সংগ্রামের পথ ছেড়ে যাব না— ২৩ জানুয়ারি কলকাতার প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে উচ্চারিত হল অঙ্গীকার। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবী ধারার জ্বলন্ত প্রতীক এই মহান বিপ্লবীর

চারের পাতায় দেখুন

২৩ জানুয়ারি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত পদযাত্রা

ক্লাসরুম শিক্ষায় 'ধীরে চলো' নীতি কী উদ্দেশ্যে

গত এপ্রিল থেকে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণের জন্য স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ। ২০২০-র শিক্ষাবর্ষ কেটে গেল কার্যত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান ছাড়াই। কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান অনলাইনে পাঠদান কোনও ক্রমে চালিয়ে ফলাফলও ঘোষণা করে দিয়েছে। স্কুল স্তরে সকলকে পাশ করিয়ে দেওয়া হয়েছে। সকলকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। অপরিকল্পিতভাবে সিলেবাস কমানো হয়েছে। যার ফল উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে ভুগতেই হবে। সকলেই উপলব্ধি করছেন, এ ক্ষতি আর দীর্ঘায়িত করা চলে না। উদ্বিগ্ন অভিভাবক, শিক্ষক, ছাত্রদের বৃহৎ অংশের দাবি— উঠছে স্কুল খুলুক, ক্লাসরুম পড়াশোনা চালু হোক। কিন্তু কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকারেরই এ বিষয়ে হেলদোল নেই। জানুয়ারি পার হয়ে গেল, অথচ নতুন শিক্ষাবর্ষে ক্লাস শুরুর কোনও লক্ষণ নেই। তবে কি অনলাইনেই চলবে শিক্ষা? সেই উদ্দেশ্যেই কি প্রাথমিক শিক্ষকদের অনলাইন শিক্ষার প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা? সেই উদ্দেশ্যেই কি ট্যাব কেনার জন্য দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের দশ হাজার করে টাকা দেওয়ার ঘোষণা?

'অনলাইন শিক্ষা প্রথাগত শিক্ষার বিকল্প হতে পারে না', এক সাক্ষাৎকারে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বললেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ফ্যাকাল্টি অফ এডুকেশনের প্রাক্তন ডিন অনিতা রামপল।

দুয়ের পাতায় দেখুন

কিসান আন্দোলনের সমর্থনে উত্তরপ্রদেশে মহিলাদের সভা

জৌনপুর, উত্তরপ্রদেশ। ১৮ জানুয়ারি

ক্লাসরুম শিক্ষা

একের পাতার পর

কথাটি সত্য। ছাত্রছাত্রীরা শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের কাছ থেকে যতটুকু শেখার সুযোগ পায়, অনলাইন ক্লাসে তা সম্ভব নয়। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকরা যে স্বকীয়তা নিয়ে, বিশেষ বিশেষ ছাত্রের অবস্থা বুঝে যে বিশেষ বিশেষ সৃজনশীল ভূমিকা নিয়ে পড়াতে পারেন, অনলাইনে তা একেবারেই অসম্ভব। অধ্যাপক রামপলের মতে, অনলাইন ব্যবস্থায় শিক্ষকরা একটা সিস্টেমে বাঁধা পড়ে থাকেন, সিস্টেমটা যেমন, তেমনভাবেই শিক্ষককে চলতে হয়। কোনও স্বকীয়তার সুযোগ নেই। তাঁর মতে, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষকের কাছ থেকে যতটুকু শেখে, তার চেয়ে অনেক বেশি শেখে পরস্পরের কাছ থেকে। এক সঙ্গে কাজ করা, একত্রে চিন্তা করা— এসব থেকে তারা অনেক কিছু শেখে। অনলাইন শিক্ষা ছাত্রদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে। এ ক্ষতি সাংঘাতিক। তা ছাড়া অনলাইনে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব সুশৃঙ্খলভাবে চালানো বা ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগ যথাযথভাবে রক্ষা করাও যায় না।

অধ্যাপক রামপল বলেন, এটা খুব বেদনার যে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০-তে অনলাইন শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এটা ছাত্রদের শিক্ষার মৌলিক অধিকারের বিরোধী। কারণ, সকলে এর সুযোগ পাবে না। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব। অনলাইন শিক্ষার সুযোগ নেওয়া এবং চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক সঙ্গতি তাদের নেই। ডিজিটাল পরিকাঠামোও দেশের সর্বত্র নেই। বহু গ্রামাঞ্চল আছে, যেখানে বিদ্যুৎ নেই। নেই দ্রুতগতির ইন্টারনেট ব্যবস্থা। এই অবস্থায় ডিজিটাল শিক্ষায় কায়েম হবে বৈষম্য।

তা হলে অনলাইন শিক্ষা নিয়ে সরকার এত উদগ্রীব কেন? এর পেছনে রয়েছে তথ্য প্রযুক্তি কোম্পানি মালিকদের চাপ। তথ্যপ্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত বৃহৎ পুঁজিপদিদের সামনে বিরাট বাজার খুলে দিয়েছে অনলাইন শিক্ষা। কিছু দিন আগেই উচ্চশিক্ষার অনলাইন কোর্সের বৃহৎ কোম্পানি 'আপগ্রাড' সারা দেশের নানা কেন্দ্রীয় সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি লিখে অনলাইন শিক্ষা ব্যবসাকে যৌথ উদ্যোগে সম্প্রসারিত করার আহ্বান জানিয়েছে। কোম্পানির অন্যতম কর্তা রনি স্ক্রুয়ালা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানদের ব্যবসায় যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, 'আমাদের কোম্পানি এখন মুম্বাই ইউনিভার্সিটি, জিন্দাল গ্লোবাল ইউনিভার্সিটি, আইআইটি মাদ্রাজ সহ ১৫টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হিসাবে পূর্ণ সময়ের অনলাইন ডিগ্রি কোর্স চালু করার কাজ করছে।

অনলাইন শিক্ষার উপর জোর কি কেবলমাত্র করোনা মহামারিজনিত পরিস্থিতিতে জরুরি বলে ভেবেছে সরকার? ২০১৯ থেকেই কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় শিক্ষানীতিতে কমপক্ষে ৫০ শতাংশ ছাত্রকে অনলাইনের আওতায় আনার পরিকল্পনা করেছে। এর শুরু ২০১৫-১৬ সাল থেকে। এই অনলাইন শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য সার্টিফিকেট বেচা। কে কী শিখল তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে গঠিত বিড়লা-আম্বানি কমিশন ২০০০ সালে বলেছিল, কৃষি এবং শিল্পের চেয়ে শিক্ষা অনেক বেশি মুনাফাদায়ক। শিল্পে সর্বাত্মক মন্দার কারণে একচেটিয়া পুঁজি মালিকদের এখন লক্ষ্য শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো পরিষেবাগুলিকে কর্পোরেট ব্যবসার আওতায় আনা। এ জন্যই বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থাও এ দিকে মন দিয়েছে। ভারতীয় একচেটিয়া পুঁজিমালিকরা শিক্ষা বিপণি নিয়ে অন্য দেশের বাজারে শিক্ষা ব্যবসায় ঢুকতে নিজের দেশের বাজারে বিদেশি শিক্ষা ব্যবসায়ীদের ঢোকার ছাড়পত্র দিচ্ছে। সেই লক্ষ্যেই সাজানো হয়েছে জাতীয় শিক্ষানীতিকে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাথে গুগল কোম্পানির সিইও সুন্দর পিচাইয়ের বৈঠকে ভারতের ডিজিটাল শিক্ষায় গুগল ৭৫ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করার কথা ঘোষণা করেছে। ভারতের আর্থ সামাজিক পরিস্থিতিতে এই অনলাইন শিক্ষা এক নতুন বৈষম্যের জন্ম দেবে। দুই তৃতীয়াংশ ছাত্র-ছাত্রীর পক্ষে এই শিক্ষা কেনার সামর্থ্য প্রায় নেই। আর যারা কিনবে তারাও পাবে প্রাণহীন একটা শিক্ষার খোলস। যার চকচকে মোড়কটুকুই সম্বল। এ দিয়ে ছাত্রদের না হবে শিক্ষা, না হবে কারিগরি দক্ষতা। হবে না সামাজিক দায়বদ্ধতা, বা চরিত্র গঠনের শিক্ষা। অনলাইন শিক্ষায় সরকারের লাভ কী? তার লাভ, শিক্ষাখাতে খরচ কমবে। আর যে পুঁজি মালিকরা অনলাইন শিক্ষা বেচবে তাদের টাকার থলির আশীর্বাদ পাবে নেতা-মন্ত্রীরা। এ তো একটা বিরাট দায় থেকে সরকারের মুক্তি!

তা হলে ক্ষতি কার? ক্ষতি ছাত্রছাত্রীদের। ক্ষতি শিক্ষার গুণগত মানের। অনলাইন শিক্ষার উপযোগী সিলেবাস হবে। অনলাইনে উত্তর দেওয়ার মতো বহু বিকল্পধর্মী প্রশ্ন হবে, যেখানে লিখে প্রকাশ করার সুযোগ কম, বিশ্লেষণের ব্যাপার প্রায় নেই। এই পরিস্থিতি ছাত্রদের চিন্তাশক্তির বিকাশের অন্তরায়। শিক্ষার এই অবনমন শেষপর্যন্ত সমাজ বিকাশের প্রতিবন্ধক হবে। এই অবস্থায় ক্লাসরুম শিক্ষার মতো প্রথাগত শিক্ষা চালু করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি।

'পিএম-কিসান' বনাম 'কৃষকবন্ধু' কোনওটিই কৃষক সমস্যার সমাধান নয়

এপ্রিলে পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এমনই ইঙ্গিত দিয়েছে। এই ভোটের দিকে তাকিয়েই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও রাজ্যের তৃণমূল সরকার প্রতিযোগিতায় নেমেছে কে কত জনদরদি তা প্রমাণ করতে। উভয়ই প্রকল্পের পর প্রকল্পের ঘোষণা করছে। এতে সাধারণ মানুষের উল্লসিত হওয়ারই কথা, কিন্তু তাঁরা দেখছেন আসলে এ সবই ফাঁকা আওয়াজ মাত্র।

কেন্দ্রের সরকার বলছে, 'প্রধানমন্ত্রী কিসান সম্মাননিধি যোজনা'র মধ্য দিয়ে কৃষকদের ভাল করব। রাজ্য সরকার বলছে 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের মানোন্নয়ন ঘটাব। ভাল থেকে আরও ভাল করার প্রতিযোগিতা হলে মন্দ কী? কিন্তু খটকা-টা অন্য জায়গায়।

কেন্দ্রীয় সরকার বলছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিদের চাষে সহায়তা করতে বছরে ৬ হাজার টাকা দেওয়া হবে। অর্থাৎ, পরিবার পিছু বরাদ্দ মাসে ৫০০ টাকা। পরিবারের সদস্য চার জন ধরলে মাথাপিছু মাসিক বরাদ্দ ১২৫ টাকা। এই হিসাবে দৈনিক মাথাপিছু বরাদ্দ মাত্র ৪ টাকা, যা দিয়ে এক কাপ চাও জুটবে না। এটা কি কৃষকদরদ না কি কৃষকদের দুর্দশা নিয়ে তামাশা? এই ভিক্ষাতুল্য অনুদানটুকুও যাতে নির্ঝঞ্ঝাটে সব কৃষক না পায় তারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে প্রকল্পে। বহু শর্ত আরোপ করা হয়েছে যাতে বড় সংখ্যায় কৃষককে বাদ দেওয়া যায়। তাতে সরকার দায়মুক্ত থাকতে পারে। এ ছাড়াও 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী কিসান সিঁচাই যোজনা', 'প্রধানমন্ত্রী কিসান মনধন যোজনা'র মতো আরও প্রকল্প রয়েছে। প্রকল্প অনেক, কিন্তু টাকার বরাদ্দ যা, তাতে কিছুই হয় না। সেদিকে সরকারের নজর নেই, তাদের একমাত্র তৎপরতা প্রকল্পগুলির প্রতিটিতেই প্রধানমন্ত্রীর নাম যুক্ত করায়। ভোটই যে একমাত্র লক্ষ্য, কৃষক কল্যাণ সেখানে নিমিত্ত মাত্র তা সহজেই বোঝা যায়।

সম্প্রতি কিসান রেল প্রকল্পে হাওড়াকে জোড়া হয়েছে এবং মহারাষ্ট্রের সাঙ্গোলা থেকে শালিমার পর্যন্ত বিশেষ ট্রেনের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। রেলপথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ফসল পৌঁছে দেওয়ার জন্যই নাকি এমন সিদ্ধান্ত! এমনকি কৃষি সম্পদ যোজনার আওতায় ফুড পার্ক, কোল্ড চেইন পরিকাঠামো, অ্যাগ্রো প্রোসেসিং ক্লাস্টারের মতো সাড়ে ৬ হাজার 'মেগা' প্রকল্পের ঘোষণা করেছেন তিনি। এগুলির সুবিধা কি গরিব-প্রান্তিক কৃষক পাবে? না কি অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ কৃষিজ পণ্যের বৃহৎ ব্যবসায়ীরা, বড় বড় পুঁজিপতিরা এর সুফল পাবে? এই বিনিয়োগ প্রধানমন্ত্রী করেছেন বৃহৎ পুঁজিপতিদের জন্যই। এমনকি খাদ্যশস্য মজুত করার বরাতও বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিচ্ছে মোদি সরকার। সরকারি সংস্থা এফসিআই-এর খাদ্যশস্য মজুত করার বরাত প্রধানমন্ত্রী দিয়েছেন তাঁর অন্যতম বন্ধু এবং নির্বাচনী তহবিলের জোগানদার আদানি এগ্রিলজিস্টিকসকে (আনন্দবাজার পত্রিকা ঃ ৪।১।২০২১)। আদানি গোষ্ঠীর এই সংস্থা এখন এফসিআই-এর হয়ে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, তামিলনাড়ু, কর্নাটক, মহারাষ্ট্র, পশ্চিমবঙ্গে ৫ লক্ষ ৭৫ হাজার টন খাদ্যশস্য মজুত করার দায়িত্বে। মধ্যপ্রদেশে আরও ৩ লক্ষ টন খাদ্যশস্য মজুত করার দায়িত্ব নিয়েছে আদানি। ২০১৬-র পর থেকে এই সমস্ত চুক্তি হয়েছে। এমনকি ৩০ বছরের এই চুক্তিতে প্রতি টন খাদ্যশস্যের জন্য নির্দিষ্ট আয়ের গ্যারান্টি দেওয়া হয়েছে আদানির ওই সংস্থাকে।

বিজেপি নেতারা তারস্বরে প্রচার করছেন, কিসান সম্মাননিধি প্রকল্পের বিরাট সুযোগ নাকি পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের দিচ্ছে না রাজ্যের তৃণমূল সরকার। সম্প্রতি খবরে প্রকাশ, পিএম-কিসান প্রকল্প চালুর ক্ষেত্রে তৃণমূল সহযোগিতা করবে। শুনে আবার বিজেপি নেতারা হাত কামড়াচ্ছেন। কারণ তৃণমূল বিরোধিতার একটা ইস্যু তাদের হাতছাড়া হয়ে গেল। এ দিকে তৃণমূল সরকার বলছে, তারাই প্রকৃত কৃষকদরদি। কৃষকবন্ধু প্রকল্পের মধ্য দিয়ে তারা কৃষক পরিবারকে বছরে ৫ হাজার টাকা করে দেবে। সেই একই রকম সস্তা চমক। কৃষকদের ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার কোনও চেষ্টা কারও নেই।

কৃষকদের উপকার করাই যদি সরকারের প্রকৃত উদ্দেশ্য হত, তা হলে তাদের আসল সমস্যাগুলির সমাধান করত সরকার। সার, বীজ, কীটনাশক সস্তায় দেওয়ার ব্যবস্থা, সেচে বিদ্যুৎ বিনামূল্যে দেওয়া, ফসলের ন্যায্য দাম দেওয়ার ব্যবস্থা, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করা, ভাগচাষি-ক্ষুদ্রচাষিদের বিনা সুদে ঋণ— ইত্যাদি চাষের জন্য যা যা প্রয়োজন সে সমস্ত ব্যবস্থা কেন্দ্র-রাজ্য কোনও সরকার করছে না। উল্টে সরকারি নীতির পরিণামে বহুজাতিক কোম্পানির থেকে অগ্নিমূল্যে বীজ, সার, কীটনাশক, বিদ্যুৎ কিনতে বাধ্য হচ্ছে চাষি। তারা ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) পাচ্ছে না। সরকারি ক্রয়ব্যবস্থা না থাকার ফলে বাস্তবে জলের দরে বহুজাতিক কোম্পানির হাতে তুলে দিতে হচ্ছে রক্ত-জল করা পরিশ্রমে ফলানো ফসল, চাষের খরচটুকুও উঠছে না। পরিবার নিয়ে পথে বসছেন অনেকে। আত্মহত্যার পথে যেতে বাধ্য হচ্ছেন কৃষিজীবী মানুষ। এই পরিস্থিতি তৈরির জন্য দায়ী বর্তমানে বিজেপি, পূর্বতন কংগ্রেস সরকার। তারা দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে কৃষকদের উপর শোষণের স্টিমরোলার নামিয়ে এনেছে। পুঁজিপতিদের আরও মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগ দিতে পথে বসিয়েছে চাষিকে। এই অবস্থায় ভিক্ষাতুল্য অনুদান ঘোষণা বাস্তবে গোড়া কেটে আগায় জল দেওয়ার নামান্তর।

দিল্লির কৃষক আন্দোলন ও স্বৈরাচারী সরকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আলোচনার নামে সময় কাটানোর খেলা

শেষ পর্যন্ত আন্দোলনকারী কৃষকদের দিল্লিতে পৌঁছনো যখন আটকানো গেল না তখন মোদি সরকার শুরু করল আলোচনার নামে দিনের পর দিন সময় কাটানোর নতুন খেলা। তাদের অঙ্ক ছিল প্রবল শীতে ক'দিন পরেই কৃষকরা রণে ভঙ্গ দেবে। এই চালাকি ধরতে কৃষকদের অসুবিধে হয়নি। কৃষকরা বলেছেন একই কথা আলোচনা করে আর সময় কাটানো নয়, কৃষি আইন বাতিল হবে কিনা সেই উত্তর দাও— ইয়েস অর নো। স্বাধীন ভারতের গণআন্দোলনের ইতিহাসে এ-ও এক অভূতপূর্ব ঘটনা। যেখানে দোর্দণ্ডপ্রতাপ শাসকের চোখে চোখ রেখে কৃষকরা বলছেন, যথেষ্ট হয়েছে, এবার হ্যাঁ কিংবা না বলুন। বাঘা বাঘা মন্ত্রী-আমলারা কপালের ঘাম মুছে পরস্পরের দিকে চাওয়াচাওয়ি করেছেন। কৃষকরা নিজেদের আপসবিরোধী চরিত্র বোঝাতে আলোচনার বৈঠকে সরকারের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ না করে নিজেদের আনা খাবার খেয়েছেন।

২৬ এবং ২৭ নভেম্বরের মাত্র দুদিনের ঘোষিত ধরনা যে সারা দেশের মানুষের সক্রিয় সমর্থনে এমন শক্তি ও মর্যাদা অর্জন করবে, লাগাতার আন্দোলনের এমন তুফান তুলবে তা সরকার কল্পনা করতেও পারেননি।

কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও ছলে বলে কৌশলে আন্দোলনকে বিভ্রান্ত করতে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীও কম মাথার ঘাম পায়ে ফেলছেন না। তিনি অত্যন্ত বাকপটু। কথার মায়াজাল বুনে দেশের মানুষকে ঠকাতে, ঘায়েল করতে তাঁর তুলনা মেলা ভার। তিনি তাঁর নাটকীয় বাকপটুতাকে অক্লান্ত ভাবে ব্যবহার করছেন। দেশের মানুষকে তিনি বিশ্বাস করাতে চাইছেন যে গরিব কৃষকদের জন্যই নাকি তিনি এই আইন করেছেন। কিন্তু তাঁর পক্ষে সমস্যা হল এই নাটকীয়তা ও বাকচাতুর্য তাঁর মিথ্যাচারের স্বরূপকে ঢেকে রাখতে পারছে না।

প্রধানমন্ত্রী বলছেন এই কৃষিনীতি নাকি যুগান্তকারী, ঐতিহাসিক, তিনি নাকি এর দ্বারা সমস্ত কৃষকের লাভ দোগুণা করেই দিলেন। তাঁর রেডিও অনুষ্ঠান 'মন কি বাত'-এ তিনি বলেছেন এই আইনের ফলে নাকি কৃষকদের দীর্ঘদিনের শৃঙ্খল মোচন ঘটেছে। সত্যিই কি তাই? মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কি বলবেন কৃষকদের শৃঙ্খলটি সত্যি কোথায়? সে তো পুঁজির শোষণের শৃঙ্খল।

যদিও প্রধানমন্ত্রী তা দেখতে পান না। নিশ্চয়ই তাঁর অজানা নয় যে, কৃষককে চাষ করতে গিয়ে সার-বীজ-কীটনাশক-বিদ্যুৎ-ডিজেল ইত্যাদি কিনতে হয়। এ-সবের দাম কে নিয়ন্ত্রণ করে? বড় বড় কর্পোরেটদের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এই সমস্ত কিছু। তারা যে দাম নির্ধারণ করে, কৃষক সেই দামে কিনতে বাধ্য হয়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই কর্পোরেটরা চাষিদের ইচ্ছামত লুন্ঠন করে। আবার ফসলের দাম নির্ধারণ করবার কোনও স্বাধীনতা কৃষকের নেই। সরকারি উদ্যোগে ফসল কেনার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। ফলে চাষিরা বাধ্য হয় অভাবী বিক্রিতে। এখানেও বৃহৎ পুঁজির মালিক কর্পোরেট এবং তাদের দালাল ফড়েরা তাদের লুটবার সুযোগ পায়। সরকার যদি চাষির লাভ সত্যি সত্যি 'দ্বিগুণ' করতে চাইত তবে তো সার-কীটনাশক-বিদ্যুৎ-ডিজেল ইত্যাদি ন্যায্য মূল্যে পাওয়ার ব্যবস্থা করত। দ্বিগুণ লাভ যাতে হয় তার জন্য উপযুক্ত এবং লাভজনক দামে চাষির ফসল কিনবার যথার্থ কার্যকারী ব্যবস্থা করত। তা না করে যতটুকু সরকারি ক্রয় ব্যবস্থা আছে, তাকে, মান্ডিগুলোকে অকার্যকরী করে দেওয়ারই ব্যবস্থা হয়েছে। এতে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য এমএসপি উঠে যাবে। বাস্তবে কর্পোরেটদের পায়ের তলায় চাষিদের পাকাপাকিভাবে শৃঙ্খলিত করছে এ আইন।

কেন তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে কৃষকরা এতটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ

তিনটি আইনের একটি হল 'অত্যাবশ্যক পণ্য আইন'-এর সংশোধনী। চাল, ডাল, গম, ভোজ্য তেল, আলু, পেঁয়াজ আমাদের প্রতিদিনের খাদ্যে আবশ্যিক হলেও তা আর মোদি সরকারের চোখে 'অত্যাবশ্যক' থাকছে না। এই আইনের সংশোধনীতে সরকার তা বলেছে। অর্থাৎ এইসব পণ্যের দাম ও মজুত সংক্রান্ত বিষয়ে এই নতুন আইন সমস্ত নিয়ন্ত্রণ তুলে নিচ্ছে। যে যত খুশি যেমন খুশি দামে কিনতে পারে বেচতে পারে, সরকার কোনও নিয়ন্ত্রণ করবে না। শুধুমাত্র যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, অস্বাভাবিক রকমের মূল্যবৃদ্ধি এবং ভয়ঙ্কর প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা অফিশিয়াল গেজেটে নোটিফিকেশন হলে তবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। খাদ্যশস্যের দাম এক বছরে অন্তত দেড় গুণ এবং উদ্যান ফসলের দাম দ্বিগুণ না বাড়লে তাকে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ চালের গড় দাম এ বছর ৩০ টাকা কেজি হলে আগামি বছর তা বেড়ে ৪৪ টাকা কেজি হলেও সরকারের কাছে অস্বাভাবিক বলে গণ্য হবে না। যেহেতু এই খাদ্য দ্রব্যগুলি আর অত্যাবশ্যক হিসাবে গণ্য হচ্ছে না, তাই যত খুশি মজুত করতে মজুতদারদের আর কোনও বাধা থাকছে না। মজুতদারির অবাধ সুযোগ গরিবের উপকারের জন্য করা হচ্ছে— এ উদ্ভট দাবি আমাদের বাকপটু প্রধানমন্ত্রী ছাড়া বোধ করি আর কেউ করতে পারেন না।

দ্বিতীয় আইনটি হল 'কৃষি উৎপাদনের ব্যবসা ও বাণিজ্য (সহায়তা ও সম্প্রসারণ) আইন ২০২০'। এই আইনবলে এপিএমসি মার্কেটের বাইরে যে কোনও জায়গা থেকে ক্রেতারা চাষির উৎপাদিত পণ্য কিনতে পারবে। চাষির উৎপাদিত পণ্য বলতে চাল, গম সহ সব ধরনের দানাশস্য, সব রকম ডাল, ভোজ্য তেল ও তৈলবীজ, সবজি, ফল, মাছ, মাংস, দুধ ইত্যাদি। অর্থাৎ চাষিদের উৎপাদিত খাদ্যদ্রব্যের প্রায় পুরোটারই বেচাকেনায় এখন থেকে আর কোনও রকম সরকারি নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। ক্রেতারা সরকার নিয়ন্ত্রিত কৃষিমান্ডির বাইরে, রাজ্যের বা রাজ্যের বাইরে থেকে যত খুশি, যেখান থেকে খুশি কৃষিপণ্য কিনতে পারবে। এমনকি অনলাইনেও চলবে সেই বেচাকেনা।

অত্যাবশ্যক পণ্য আইনের সংশোধনী এবং কৃষিপণ্যের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত আইন দুটি আলাদা। তাই আলাদাভাবে পড়লে বোঝা যাবে না যে, এই দুই আইনের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। প্রথম আইনের সংশোধনী এনে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের অর্থাৎ চাল, ডাল, গম, আলু, পেঁয়াজ, ভোজ্য তেলের যত খুশি মজুত করার অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং নতুন আইনটিতে যত খুশি কেনার অধিকার দেওয়া হচ্ছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে যত খুশি কিনতে এবং যত খুশি মজুত করতে পারবে কারা। নিশ্চয়ই কোনও ছোট বা মাঝারি ব্যবসায়ী তা পারবে না। এখন দেশি-বিদেশি কর্পোরেট হাউস এইসব কৃষিজাত পণ্য খুচরো বিক্রির ব্যবসায়ে বিপুল পুঁজি নিয়ে নেমেছে। এর মধ্যে আদানি এবং আম্বানিরা আবার নরেন্দ্র মোদি সরকারের পরিপূর্ণ মদতে দানবের আকার নিয়েছে। এটাও সংবাদে প্রকাশ যে, আদানিরা সম্প্রতি বিজেপি শাসিত হরিয়ানার পানিপথে এবং অন্যান্য রাজ্যে বিপুল পরিমাণ জমি কিনে বিশাল বিশাল গুদাম, সাইলো, হিমঘর নির্মাণ করেছে। বিশাল এবং বিপুল সংখ্যক এই গুদাম, সাইলো ও হিমঘরগুলিতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যদ্রব্য মজুত করতে এমন দুটি আইনের খুবই প্রয়োজন ছিল। আর ঠিক তখনই মোদি সরকার এই আইন দুটি এনেছে। ফলে আজ যে আওয়াজ উঠছে আদানি ও আম্বানিদের বিরুদ্ধে, তার যথার্থ যৌক্তিকতা রয়েছে। নরেন্দ্র মোদিকে সরকারি ক্ষমতায় আনতে এই দুই পুঁজিপতি গোষ্ঠী যে প্রচার, অর্থ ও সাহায্য দিয়েছে, তাদের প্রতি মোদি দায়বদ্ধ। তাই তিনি আর জনগণের 'চৌকিদার' না হয়ে লুঠেরা কর্পোরেট গোষ্ঠীর চৌকিদারে পরিণত হয়েছেন।

উত্তরপ্রদেশের জৌনপুরে কিসান আন্দোলনের সমর্থনে বাইক র‍্যালি

মোদিজি দেশের জনগণকে এবং কৃষকদের বিভ্রান্ত করতে বলছেন, কৃষিমান্ডি তো তুলে দেওয়া হচ্ছে না, কৃষিপণ্যের বাজারকে সম্প্রসারিত করতে মান্ডির বাইরেও কেনাবেচা করার জন্য চাষিদের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আজ সরকারি কৃষি মান্ডি রেখে মান্ডির বাইরে যথেচ্ছ পরিমাণে ফসল কিনতে দেওয়ার মানে হল, আদানি-আম্বানিদের এজেন্টরা সরাসরি কৃষকদের কাছে গিয়ে প্রথম প্রথম একটু বেশি দাম দিয়ে পুরো ফসলই কিনে নেবে। দাম বেশি পাওয়ায় চাষিরা এদের কাছেই ফসল বেচবে। প্রথম এক-দু বছরের তথ্য বলবে, নতুন আইনের ফলে চাষি লাভবান হচ্ছে। প্রথম ছয় মাসে 'জিও'র গ্রাহকরা এমন লাভবানই হয়েছিল। ফলে দু'বছর যদি চাষিদের কাছ থেকে একটু বেশি দাম দিয়ে সব ফসল তারা কিনে নিতে পারে তাহলে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের যেমন ব্যবসা থেকে হটিয়ে দেওয়া যাবে তেমনি সরকারি মান্ডিগুলি শুকিয়ে বন্ধ হয়ে যাবে। বেসরকারি মান্ডি খোলার অধিকার দেওয়ায় তখন এই কর্পোরেটরাই সেই মান্ডিগুলি কিনে নেবে। ছোট ব্যবসায়ীরা হটে যাওয়ায় এবং সরকারি মান্ডি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কৃষকের তখন কর্পোরেট সংস্থাগুলির বাইরে অন্য কোথাও ফসল বিক্রির কোনও সুযোগই থাকবে না। তখন এই কর্পোরেটদের কাছেই চাষিকে হত্যে দিতে হবে। কর্পোরেট প্রভুরা দয়া করে যে দাম দেবে সেই দামে ফসল বিক্রি করতে বাধ্য হবে।

এর ভয়াবহ বিপদ শুধু কৃষকদের উপর নেমে আসবে তা নয়। সর্বস্তরের জনগণের ওপরও নেমে আসবে। বিপদ দু'দিক থেকে। প্রথমত, সর্বোচ্চ মুনাফা কামানোর জন্য প্রভাব খাটিয়ে কর্পোরেটরা কৃষকদের কম দাম দেবে। দ্বিতীয়ত, তারা খাদ্যপণ্যের উপর একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে ইচ্ছামতো দাম বাড়াবে। এতে কৃষক, অ-কৃষক নির্বিশেষে সমস্ত মানুষের জীবন তীব্র মূল্যবৃদ্ধিতে জেরবার হয়ে যাবে। সরকারি ক্রয় ব্যবস্থার মাধ্যমে বিশেষ করে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার সাথে দেশের মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা, রেশনিং ব্যবস্থা, দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের জন্য অন্ত্যোদয়-এর মতো প্রকল্পগুলি, হাসপাতালের রোগীদের খাদ্য সরবরাহ, এমনকি পুলিশ-মিলিটারির রেশনের সরবরাহ ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কিত। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য না থাকা এবং সরকারি মান্ডির মাধ্যমে ক্রয় ও সংগ্রহের ব্যবস্থা কর্পোরেটদের হাতে চলে গেলে দেশের রেশন ব্যবস্থাও ভেঙে পড়তে বাধ্য। দরিদ্র প্রান্তিক মানুষদের ন্যূনতম খাদ্য নিরাপত্তার প্রকল্পগুলির পরিণতিও সহজেই অনুমান করা যায়। এমনকি পুলিশ-মিলিটারির রেশন জোগানোর জন্য

সাতের পাতায় দেখুন

নেতাজির উত্তরাধিকার বহনের অঙ্গীকার

একের পাতার পর

১২৫তম জন্মবার্ষিকীর সূচনা উপলক্ষে তাঁর স্মৃতি বিজড়িত প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে নেতাজি মূর্তি পর্যন্ত এক বিশাল পদযাত্রায় সামিল হলেন পাঁচ সহস্রাধিক ছাত্র-যুব-মহিলা সহ সমাজের নানা স্তরের মানুষ।

২৩ জানুয়ারি বাংলা তথা ভারতের মানুষের কাছে গভীর আবেগ ও ব্যথার দিন। এই মহান বিপ্লবীর জন্মদিনটিতে প্রতি বছর অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা নিয়ে তাঁকে স্মরণ করেন সাধারণ মানুষ। সে স্মরণে শ্রদ্ধার সঙ্গে মিশে থাকে এক গভীর ব্যথা— স্বাধীনতা এসেছে, কিন্তু তাঁর শোষণমুক্ত ভারতের স্বপ্ন সফল হয়নি। স্বাধীন ভারতের মাটি তাঁর স্পর্শ পায়নি। শোষণহীন সমাজ গড়ার স্বপ্ন দেখা ছাত্র-যুবক-শ্রমিক-কৃষক সহ সাধারণ মানুষের কাছে এই দিনটি পালনের তাৎপর্য অত্যন্ত গভীর।

একদিকে এই প্রয়াস, অন্য দিকে এই মহান বিপ্লবীর প্রতি মানুষের আবেগকে পুঁজি করে ভোটে ফয়দা তোলার চেষ্টায় কিছু রাজনৈতিক দলের তৎপরতা। স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় নেতাজি সুভাষচন্দ্রের সাথে এদের আচরণের ইতিহাস এতটাই কলঙ্কজনক যে, আজকের এই ধুমধাম, আড়ম্বর মেনে নিতে কষ্ট হচ্ছে মানুষের। এই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে ছাত্র সংগঠন এ আই ডি এস ও, যুব সংগঠন এ আই ডি ওয়াই ও, মহিলা সংগঠন এ আই এম এস এস, কিশোর সংগঠন কমসোমল এবং সাংস্কৃতিক সংগঠন পথিকৃৎ ডাক দিয়েছিল রাজ্য জুড়ে নেতাজি স্মরণ ও তাঁর অপূরিত স্বপ্নপূরণের অঙ্গীকার গ্রহণের।

২৩ জানুয়ারি সকাল থেকেই কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলার ছাত্র যুব মহিলা ও কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনীর স্বেচ্ছাসেবকরা আসতে শুরু করেছিলেন প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে। তাঁদের চোখে মুখে এক অভূতপূর্ব প্রত্যয়। আসার পথেই তাঁরা অনুভব করেছেন তাঁদের প্রতি মানুষের আশা কী গভীর। বরানগর থেকে ২২২ নম্বর রুটের বাসের কন্ডাক্টররা কেউ তাঁদের ভাড়া নেননি। এমন আরও কত সহযোগিতা তাঁরা পেয়েছেন। কলকাতার ঘোষবাগান এলাকা থেকে আসা ছাত্র শুভ মাজী সকালে এ আই ডি এস ও-র দাদাদের সাথে পাড়ায় নেতাজি জয়ন্তী পালন করেছেন। পদযাত্রায় এসে উচ্ছ্বসিত, 'নেতাজির ছবি নিয়ে হাঁটব। দারুণ আনন্দ হচ্ছে'। নেতাজির উপর রচিত গান পরিবেশন করে অভিভূত হাওড়ার ছাত্র শুভ্রাংশু মণ্ডল বলে ওঠে, 'গানটা গাইলেই বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে।' কলেজ স্ট্রিট বই পাড়ার এক বর্ষীয়ান দোকানদার আবেগভরা কণ্ঠে দেশাত্মবোধক গান পরিবেশন করলেন। কমসোমলের ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক ব্যস্ত শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতিতে। ব্যান্ড বাহিনীও ঝালিয়ে নিচ্ছে শেষ বার। এই পরিবেশ দেখে অভিভূত বই কিনতে আসা এক দল ছাত্র নিজেদের মোবাইল ক্যামেরায় বন্দি করে নিলেন সমস্ত মুহূর্ত। এক ছাত্র বলে উঠলেন, 'কী দারুণ ডিসিপ্লিন'!

২৩ জানুয়ারি গুজরাটের আহমেদাবাদে নেতাজি স্মরণ

শুরু হল সভা। বক্তব্য রাখলেন এআইডিএসও-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মণিশঙ্কর পট্টনায়ক, এআইডিওয়াইও-র রাজ্য সভাপতি তমাল সামন্ত। সবশেষে বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ১২৫তম জন্মবর্ষ কমিটির সম্পাদক ডাঃ অশোক সামন্ত। আগামী ১ বছর জুড়ে নেতাজি স্মরণে নানা উদ্যোগ নেওয়ার এবং সকলকে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান তিনি। সভায় উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল বাসদ (মার্কসবাদী)-র নেতা ফকরুদ্দিন কবীর আতিক এবং বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের নেত্রী নাঈমা খালেদ মনিকা। সভা পরিচালনা করেন এআইএমএসএস-এর রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত।

শুরু হল পদযাত্রা। প্রথমেই কমসোমলের ১২৫ জন স্বেচ্ছাসেবক নেতাজির ১২৫তম জন্মবার্ষিকীর আহ্বান সম্বলিত পতাকা বাহক। তারপর সংগঠন গুলির নেতৃবৃন্দ। সুশৃঙ্খল সুসজ্জিত মিছিল এগিয়ে চলেছে শ্যামবাজারের দিকে। পদযাত্রা এগোনোর সাথে সাথে রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষজন অবাক বিস্ময়ে মিছিল দেখছেন। ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির সামনে এক ঠেলা রিক্সা চালক তাঁর সঙ্গীকে বলছেন, 'দিনভর ইতনা জুলুস দেখা, লেকিন ইতনা আচ্ছা নেহি দেখা'।

পদযাত্রায় অংশ নিয়েছেন দূর-দূরান্ত থেকে আসা ছাত্র-যুবক-যুবতী মহিলা সহ সমাজের নানা অংশের মানুষ। পথ দীর্ঘ, কিন্তু কারও ক্লান্তি নেই। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী তৃষিতা পাল আগে কোনও মিছিলে হাঁটেননি। নেতাজির ছবি নিয়ে হাঁটতে শুরু করে বললেন 'এর অনুভূতি অন্য রকম।' পদযাত্রা তখন হেদুয়া পেরিয়েছে। বাড়ির বারান্দা, ছাদ, জানলায় অসংখ্য মুখের ভিড়। রাস্তায় নেমে এসেছেন শত শত মানুষ। তাঁদের চোখ ভরা আশা। ছাত্র-যুবদের প্রতিটি দৃপ্ত পদক্ষেপ তাঁদের মনে সঞ্চারিত করছে এক গভীর অনুভূতি— 'এই তো, এরা আছে! এরাই তো আশা।' সুভাষচন্দ্রের উত্তরাধিকার বহনের শক্তি নিয়ে চলেছেন এই ছাত্র-যুব-মহিলা-কিশোর-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কর্মীর দল।

হাতিবাগান বাজারের ব্যবসায়ীরা অভিভূত। আরও মিছিল তাঁরা সেদিন দেখেছেন, দেখেছেন সরকারি দলের মিছিল। পদযাত্রার বলিষ্ঠতা, শৃঙ্খলা, অংশগ্রহণকারীদের মগ্নতা তাঁদের টানছিল চুম্বকের মতো। বাজার সমিতির সহ সম্পাদক তাই পরের দিনও জনে জনে ভাগ দিয়েছেন তাঁর মুগ্ধ আবেশের। পদযাত্রা দেখতে দেখতে এক ব্যক্তি পাশের জনকে বললেন, এঁরা যে অন্যদের থেকে আলাদা মিছিলের শৃঙ্খলা দেখলেই তা বোঝা যায়। হাতিবাগানের জামা কাপড়ের এক হকার বলে উঠলেন, 'সকাল থেকে অনেক মিছিল হয়েছে। আবার একটা মিছিল আসছে দেখে কিছুটা বিরক্ত হয়েছিলাম। কিন্তু শুরুতেই ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা যে ভাবে হাঁটছে, তা দেখে সব ভুলে গেছি'। কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনীর পায়ের তাল ঢেউ তুলেছে তাঁদের বুকে।

ঘড়িতে তখন বিকাল পৌনে চারটে প্রায়, পদযাত্রা প্রবেশ করছে শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড়ে। আশপাশের দোকানদার-ক্রেতারা বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। পড়ন্ত বিকেলের সূর্যের লাল আভা পড়ছে পদযাত্রার উপর। নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করলেন এসইউসিআই(সি)-র রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, বাংলাদেশ নারীমুক্তি কেন্দ্রের কমরেড নাঈমা খালেদ মনিকা এবং পাঁচটি সংগঠনের রাজ্য নেতৃবৃন্দ। মহান বিপ্লবীর প্রতি গার্ড অফ অনার দিয়ে শ্রদ্ধা জানাল কমসোমল। মিছিলের শেষ ভাগ তখনও হেদুয়ায়। ফিরে যাওয়ার পথে হুগলির চুঁচুড়া থেকে আসা এমএসসির ছাত্রী শর্মিষ্ঠা সামন্ত বলে গেলেন, 'এমন পদযাত্রায় অংশ নিতে পারার স্মৃতি অমলিন হয়ে থাকবে।' নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর উত্তরাধিকার বহনের অঙ্গীকারের মধ্যেই জাঁকজমক আর আড়ম্বর থেকে পৃথক করে যথার্থ অর্থে বিপ্লবীর জন্মবর্ষ পালনের সূচনা ঘটাল এই পদযাত্রা।

বাবার শিক্ষার সাথে বিজেপির আদর্শ মেলে না ঃ নেতাজিকন্যা অনিতা

'আমার বাবা সব ধর্মের মানুষ, সব ভারতীয়কে সঙ্গে নিয়ে দেশপ্রেমের আদর্শকে মেলে ধরেছিলেন। বিজেপির মধ্যে ধর্মীয় সহিষ্ণুতার আদর্শের ঘাটতি আমার বাবার আদর্শের সঙ্গে মেলে না।' ২৩ জানুয়ারি নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মবর্ষের সূচনা উপলক্ষে জার্মানি থেকে হোয়াটসঅ্যাপ কলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বললেন, তাঁর কন্যা অনিতা বসু পাফ। (আনন্দবাজার পত্রিকা ২৪ জানুয়ারি ২০২১)

আগের দিন 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' পত্রিকাকে দেওয়া এক ই-মেল সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, বাংলার আসন্ন ভোটের দিকে তাকিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে যে টক্কর দেখা গেল তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ২৩ জানুয়ারি কী নামে চিহ্নিত হবে, এ নিয়েও যে প্রতিযোগিতা চলেছে তাকেও অর্থহীন বলেন তিনি। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, এই মহান বিপ্লবীর জীবনের সম্পূর্ণ ইতিহাস বাদ দিয়ে তাঁর অন্তর্ধান নিয়েই অতিরিক্ত চর্চা হয় ভারতে— যা নেতাজিকে সঠিকভাবে চিনতে বর্তমান প্রজন্মকে সাহায্য করে না।

তিনি বলেন, এতদিন বাদে নেতাজির মতো মানুষকে ভারতরত্ন দেওয়া অর্থহীন। আজও যে ভারত সরকার আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিকদের স্বাধীনতা সংগ্রামী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি তা অত্যন্ত লজ্জার এবং বেদনার বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর আরও অভিমত, কেন্দ্রীয় সরকার যে 'ডিক্ল্যাসিফায়েড' ফাইলের নামে কিছু নথি প্রকাশ করেছে, তাতে অজানা কিছুই নেই। থাকবার কোনও আশাও তিনি করেননি। নেতাজির মতো বিপ্লবীদের যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নতুন করে লেখা উচিত বলে তিনি মনে করেন।

কিসান আন্দোলনের সমর্থনে ১৮ জানুয়ারি মহিলা সংহতি দিবস পালিত

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানাতে ১৮ জানুয়ারি দেশ জুড়ে পালিত হয় মহিলা সংহতি দিবস। এ রাজ্যের জেলায় জেলায় দিনটি পালিত হয় সভা-সমাবেশের মধ্য দিয়ে। বর্ধমান শহরে এআইএমএসএসের সভা (বাঁদিকে)। ওই দিন শিলিগুড়ি শহরে এআইকেকেএমএসের নেতৃত্বে অবস্থান করছেন মহিলারা

১২ ফেব্রুয়ারি রাজভবন অভিযানের ডাক পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের

আশাকর্মীদের সরকারি স্থায়ী স্বাস্থ্যকর্মীর স্বীকৃতি, ৪৫তম আন্তর্জাতিক শ্রম সম্মেলনের সুপারিশ মেনে ন্যূনতম মাসিক বেতন ২১ হাজার টাকা, উপযুক্ত পরিকাঠামো ও পারিশ্রমিক ছাড়া অবিলম্বে দিশা ডিউটি বন্ধ করা, সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ আক্রান্ত আশাকর্মী বা তার পরিবারের সদস্যের প্রাপ্য ক্ষতিপূরণের ১ লক্ষ টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করা, কর্মরত অবস্থায় মৃত আশাকর্মীর ক্ষতিপূরণ সহ তার পরিবারের কোনও একজনের চাকরির ব্যবস্থা, অতিরিক্ত কোভিড ভাতা বন্ধ না করা, স্বাস্থ্য বহির্ভূত কোনও কাজ (খেলা, মেলা, দুয়ারে সরকার) আশাকর্মীদের দিয়ে না করানো প্রভৃতি দাবিতে ২৩ জানুয়ারি উলুবেড়িয়া ব্লক-২ আশাকর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বক্তব্য রাখেন হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) আশাকর্মী ইউনিয়নের সভাপতি নিখিল বেরা ও পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন প্রমুখ। তাঁরা বলেন, ১২ ফেব্রুয়ারি এই দাবিতে রাজভবন অভিযান হবে। সম্মেলনে সুপর্ণা পালকে সভানেত্রী, সাথী কোলে ও সুমতি নস্করকে যুগ্মসম্পাদক ও সাহানা সুলতানাকে কোষাধ্যক্ষ করে উলুবেড়িয়া ব্লক-২ কমিটি গঠিত হয়।

এবার সরকারের হয়ে খাদ্যশস্য মজুত করবে আদানিরা

কেন্দ্রের মোদি সরকার যে দেশের প্রায় সব সম্পদই তুলে দিতে চায় বৃহৎ পুঁজিপতিদের হাতে, তা স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে একের পর এক ঘটনায়। সম্প্রতি প্রকাশ্যে এল, সরকারি সংস্থা এফসিআই-এর খাদ্যশস্য মজুত করার বরাত দেওয়া হয়েছে আদানির সংস্থাকে। চুক্তি হয়েছে ৩০ বছরের জন্য। প্রতি টন খাদ্যশস্যের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ আয়ের গ্যারান্টিও কেন্দ্রীয় সরকার দিয়েছে আদানি কোম্পানিকে।

নতুন কৃষি আইনে মজুতদারদের যত খুশি খাদ্যশস্য মজুত করার অনুমতি দিয়েছে বিজেপি সরকার। সঙ্গে দিয়েছে চুক্তি চাষের মাধ্যমে সরাসরি চাষির থেকে ফসল কেনার অধিকার। এই নতুন আইন কাদের স্বার্থে আনা হয়েছে, এফসিআই-এর মতো বৃহৎ সরকারি সংস্থার হয়ে খাদ্যশস্য মজুতের দায়িত্ব আদানির হাতে তুলে দেওয়ার ঘটনায় তা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। ঋণে জর্জরিত চাষির কাছ থেকে ন্যূনতম মূল্যে খাদ্যশস্য কেনার দায়টুকুও ঝেড়ে ফেলতে চাইছে মোদি সরকার। সেই সরকারই কীভাবে ও কোন উদ্দেশ্যে আদানির মতো কর্পোরেট সংস্থাকে আয়ের গ্যারান্টি দিচ্ছে— তা বুঝতেও কারও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়নের ডেপুটেশন

১৮ জানুয়ারি পশ্চিমবঙ্গ সরকারি কর্মচারী ইউনিয়ন, বাঁকুড়া জেলা কমিটি জেলাশাসক দপ্তরে বিক্ষোভ দেখায়। জেলাশাসককে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

ইউনিয়নের দাবি, স্যাটের রায়কে মান্যতা দিয়ে অবিলম্বে বকেয়া সহ কর্মচারীদের প্রাপ্য ডিএ দিতে হবে, কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-ডি থেকে কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-সি তে পদোন্নতি ত্বরান্বিত করতে হবে, কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-ডি কর্মচারীদের পিএফ, পেনশন ও অক্ষম কর্মচারীর পোষ্যের চাকরি দিতে হবে, কর্মরত অবস্থায় মৃত কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-ডি কর্মচারীর পবিরারের একজনকে কাজ দিতে হবে, সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের ১২ ঘন্টার ডিউটি রদ করতে হবে, জুলাই থেকে বকেয়া মাইনে অবিলম্বে প্রদান করতে হবে, মাসে ২৮ দিনের কাজ দিতে হবে। সরকারি নির্দেশিকা মেনে এইচআরএমএস-এর মাধ্যমে মাইনে দিতে হবে। এজেন্সি প্রথা বাতিল করে সমস্ত ডিআরডব্লিউ কর্মীদের সরাসরি দপ্তর থেকে মজুরি প্রদান করতে হবে। গ্রুপ-ডি সহ অন্যান্য পদগুলির দ্রুত পদোন্নতি ও শূন্য পদে লোক নিয়োগ করতে হবে।

অতিরিক্ত জেলাশাসক কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-ডি থেকে কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-সি তে পদোন্নতির বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার ও সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ারদের বিষয়গুলি নিয়ে ডিডিএমও-র সাথে কথা বলে সমাধান করবেন বলে আশ্বাস দেন। এজেন্সির মাধ্যমে যে সব কর্মচারী কাজ করছেন তাদের যাতে এইচআরএমএস-এর মাধ্যমে মাইনে দেওয়া যায় সে ব্যাপারে তিনি নজর দেবেন বলে জানান। দুই মৃত ও আর্থিক ভাবে দুর্বল কনট্র্যাকচুয়াল গ্রুপ-ডি কর্মচারীর পরিবার থেকে একজন করে সদস্যকে কাজ দেওয়ার ব্যাপারেও তিনি সম্মতি দেন।

জেলা সম্পাদক বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন কর্মচারীদের এই বঞ্চনা রোধ করতে পারে একমাত্র কর্মচারীদের সংগঠিত আন্দোলন। তিনি সমস্ত কর্মচারীদের আন্দোলনের পতাকাতলে সামিল হওয়ার আবেদন জানান।

বেসরকারিকরণের সর্বনাশা ফল ভুগছেন বঞ্চিত অধ্যাপকরা

বেসরকারি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কলেজগুলির অধ্যাপকরা চরম বঞ্চনার শিকার। লকডাউন ঘোষণার পর এপ্রিল মাস থেকেই পশ্চিমবঙ্গের বেশিরভাগ বিএড কলেজগুলো শিক্ষকদের বেতন দেওয়া বন্ধ করে দেয়। কিছু কলেজ আবার জুলাই মাস থেকে বেতন দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু কলেজ প্রাপ্য বেতনের অর্ধেক অথবা সামান্য কিছু দিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতিশ্রুতি দিয়েছে পরে কলেজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু হলে বাকি বেতন মেটানো হবে। খুব কম কলেজই আছে যারা শিক্ষকদের পূর্ণ বেতন (চুক্তি অনুযায়ী) দিচ্ছে।

বেসরকারি কলেজগুলির বক্তব্য, 'লকডাউনে ক্লাস হচ্ছে না। শিক্ষকদের কলেজে আসতে হচ্ছে না, পঠন-পাঠন বন্ধ। ট্রেনি ছাত্রছাত্রীদের থেকে টিউশন ফি আদায় হচ্ছে না। সুতরাং শিক্ষকদের বেতন দেওয়ার প্রয়োজন নেই।

শিক্ষকদের বেতন না দেওয়ার পেছনে এটা নেহাতই কুযুক্তি। কারণ, সরকার, বিশ্ববিদ্যালয় নির্দেশ দিয়েছে অনলাইন ক্লাস নিতে, ক্লাস বন্ধ করা যাবে না। তাছাড়া, কলেজগুলি চুক্তি অনুযায়ী ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে সম্পূর্ণ টিউশন ফি সংগ্রহ করে। এখানে মাসিক ভিত্তিতে ছাত্রছাত্রীরা টিউশশন ফি দেয় না। দেয় চুক্তি অনুযায়ী এক বা দুই তিন কিস্তিতে। ফলে কলেজ টাকা পায়নি এই অজুহাতে শিক্ষকদের সম্পূর্ণ বেতন বন্ধ করে দেওয়া চলে না।

উল্লেখ্য, প্রাইভেট এম এড-বি এড-ডি এল এড কলেজগুলোর সহকারী অধ্যাপকরা সরকারি কলেজের অধ্যাপকদের এক-চতুর্থাংশ বেতন পান। বেতনের পরিমাণ গড়ে ৬ হাজার থেকে ১৬ হাজার টাকা। খুব কম সংখ্যক অধ্যাপকে মাসিক বেতন ২০-২২ হাজার টাকা।

এমনিতে বেতন এত কম, তার সাথে যুক্ত হয়েছে প্রাইভেট কলেজ পরিচালন সমিতির শিক্ষকদের বেতন না দেওয়ায় নানা কৌশল। যেমন, নিয়োগপত্র না দেওয়া, চুক্তি (মূলত মৌখিক) অনুযায়ী বেতন না দেওয়া, কোনও বেতন স্কেল না থাকা, মাঝে মাঝে বেতন না দেওয়া, হঠাৎ করে বেতন কমিয়ে দেওয়া, বকেয়া রেখে দেওয়া— যাতে সেই শিক্ষক কলেজ ছেড়ে না যেতে পারেন, চাকরি ছেড়ে যেতে চাইলে বকেয়া টাকা না দেওয়া, শিক্ষকদের ব্যাঙ্ক পাসবুক-এটিএম কার্ড কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে জমা রাখা, ১০ হাজার টাকা জমা দিয়ে ২৫ হাজার টাকার চেক দেওয়া, যখন তখন বরখাস্ত করা, প্রয়োজনীয় সংখ্যায় শিক্ষক নিয়োগ না করে দু-চার জন শিক্ষক দ্বারা কলেজের বিভিন্ন বিভাগের কাজ চালানো ইত্যাদি।

এই ধরনের কলেজগুলো এনসিটিই ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে, মানবিকতা ও মানবাধিকার পদদলিত করে, বেতন বন্ধ করে শিক্ষকদের ও তাঁদের পরিবারের মানুষগুলোকে চিকিৎসাহীনতা, অপুষ্টি ও নিঃশব্দে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিচ্ছে।

এই সমস্ত কলেজগুলি সোসাইটি অ্যাক্ট দ্বারা চলে। 'নো প্রফিট নো লস' ট্রাস্টি বোর্ড থাকে। পরিচালন সমিতির দ্বারা চলে। নিয়ম অনুযায়ী পরিচালন সমিতির সম্পাদক অধ্যক্ষ। বাস্তবে বেশিরভাগ কলেজেই অধ্যক্ষ থাকে না বা থাকলেও তাঁদের ভূমিকা হয় নগণ্য। পরিচালন সমিতির ব্যক্তিরা স্থানীয় বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে বিশেষ করে সরকারি দলের সাথে যুক্ত। ফলে কলেজগুলির পক্ষে শিক্ষকদের বঞ্চনা করতে অসুবিধা হয় না। যারা এক সময় বেসরকারিকরণের পক্ষে দু'হাত তুলে সমর্থন করেছিলেন, এই নির্মম শিক্ষক বঞ্চনা নিশ্চয়ই তাদের ভ্রান্তি দূর করতে সাহায্য করবে।

শ্রম-আইন বাতিলের দাবিতে শ্রমিকদের যুক্ত মিছিল

১৮ জানুয়ারি কলকাতায় এআইইউটিইউসি সহ বামপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলির মিছিল

পাঠকের মতামত

রেলে লোকসানের গল্প

বিগত ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে রেলে পণ্য পরিবহণের হার ২০১৯ সালের তুলনায় ৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। মাত্র পাঁচটি গন্তব্যে ৩৫টি পার্সেল ট্রেন চালিয়ে ৬৫২৫ টন পণ্য পরিবহণ করা গেছে। এক মাসে আয় হয়েছে ২.১৮ কোটি টাকা। ২৪ থেকে ৩৬ ঘণ্টায় গড়পড়তা ২০০০ কিলোমিটার যাচ্ছে এই পণ্য পরিবাহী ট্রেন। স্থলপথে অন্য যে কোনও পরিবহণে যা প্রায় অসম্ভব। ৫০ শতাংশেরও বেশি সময় তো সাশ্রয় হচ্ছেই ব্যবহারকারীদেরও খরচ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কম হচ্ছে (আনন্দবাজার পত্রিকা—১১.০২.২১)।

করোনা পরিস্থিতিতে নামমাত্র ট্রেন চালিয়ে এই লাভ দেখিয়ে দিচ্ছে রেলে লোকসানের গল্প বাস্তবে মিথ্যাচার, রেলকে মুনাফালোভী কর্পোরেটদের কাছে বিক্রি করে দেওয়ার সুগভীর ষড়যন্ত্র। যাত্রী পরিবহণেও যে লোকসানের কথা বলা হচ্ছে তারও কারণ তুঘলকি সিদ্ধান্ত। সারা দেশে প্রায় ৬০০-র বেশি প্যাসেঞ্জার ট্রেনকে এক্সপ্রেস ঘোষণা করা হয়েছে। যার ফলে একই ট্রেনের ভাড়া এক ধাক্কায় তিন গুণেরও বেশি বেড়ে গেছে এবং সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে। ফলে বহু ট্রেন যাত্রীবিহীন চলছে। বেশিরভাগ ট্রেন এখনও চালু করাই হয়নি। সাধারণ মানুষের প্রয়োজনের কথা না ভেবে স্লিপার ক্লাস ও সাধারণ কামরার পরিবর্তে বাতানুকূল কামরার সংখ্যা বাড়ানো সহ রেলের স্তরে স্তরে নানা দুর্নীতির কারণে রেলে যে পরিমাণ লাভ হওয়ার কথা তা হচ্ছে না। তা সত্ত্বেও রেল এখন একটি লাভজনক সংস্থা। কিন্তু মনে রাখা দরকার দেশের সর্ববৃহৎ গণপরিবহণের উদ্দেশ্য কখনও শুধুমাত্র লাভ করা হতে পারে না। জনগণের প্রয়োজনের কথা না ভেবে যে সরকার শুধু লাভ লোকসানের নিরিখেই গণপরিবহণ চালাতে চায় তার জনবিরোধী চরিত্রকেও সবার সামনে তুলে ধরা দরকার।

নিরঞ্জন মহাপাত্র, খড়গপুর

কৃষক আন্দোলনের শিক্ষা

এতদিন ধরে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, কৃষকদের একতা নেই, তারা সঙ্ঘবদ্ধ হতে জানে না, তাদের কোনও সংগঠন নেই। ফলে চাষি চিরকাল পড়ে পড়ে মার খায়, ফসলের দাম সঠিক পায় না, দেনার দায়ে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয়। এই ধারণা যে সঠিক নয় তা দিল্লির কৃষক আন্দোলন প্রমাণ করে দিয়েছে। পাহাড়প্রমাণ বাধা ঠেলে দেড় মাসের বেশি সময় ধরে হাড় হিম করা শীত উপেক্ষা করে কেন্দ্রের কালা কৃষি আইন বাতিল ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ প্রত্যাহারের দাবিতে বীরত্বপূর্ণ লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে চাষিরা।

এ এক অভূতপূর্ব ঐতিহাসিক আন্দোলন যা গোটা পৃথিবীর পাশাপাশি আমাদের দেশের জনগণকেও ভাবিয়ে তুলেছে। তবুও শাসক বিজেপি সরকারের টনক নড়েনি। শুধু সময় পার করছে। আন্দোলনের প্রবল চাপে পড়ে সংশোধনের প্রস্তাব দিচ্ছে। আইন প্রত্যাহার করবে না, কারণ মালিক শ্রেণির কাছে সরকার দায়বদ্ধ। যে কারণে মিডিয়া এই আন্দোলনের প্রচার সেভাবে দিচ্ছে না। বৃহৎ কর্পোরেটদের বিরুদ্ধে কৃষকদের এই আন্দোলন অত্যন্ত ঐক্যবদ্ধ। এখানে জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের একটাই পরিচয়— তারা কৃষক।

এই আন্দোলনের পাশে এসেছেন বহু গুণীজন। পুরস্কার ফেরত দিয়েছেন, চাকরি ছেড়েছেন কেউ কেউ। সুইসাইড নোট লিখে আত্মঘাতী হয়েছেন এমন ঘটনাও ঘটেছে। আন্দোলনের পাশে এসেছেন চিকিৎসক, নার্স, ছাত্র, যুব, মহিলারা। এই আন্দোলনে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই আছেন, শিশুরাও সামিল হয়েছে। স্বাধীনতার পর এত বড় কৃষক আন্দোলন দেশের মানুষ এই প্রথম দেখছে। সাধারণ মানুষের করণীয় হল এই আন্দোলনে সর্বদিক থেকে সহযোগিতা করা। আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়েদেওয়া। কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন সম্পর্কে বিস্তারিত জেনে এসবের ক্ষতিকারক দিকগুলো তুলে ধরা।

শাসকরা এই আইনের পক্ষে যে সব প্রচার চালাচ্ছে, তার সবটাই জুমলা। শাসক বিজেপি সরকারের দেওয়া প্রতিশ্রুতি ফাঁকা আওয়াজ ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের সকলকে বুঝতে হবে, আন্দোলনই দাবি আদায়ের একমাত্র পথ।

বিদ্যুৎ সীট, জগদল্লা, বাঁকুড়া

মানুষ ধুঁকছে অপুষ্টি-অনাহারে
সরকার বাড়তি চাল-গম দিচ্ছে মদ ব্যবসায়ীদের

গত ডিসেম্বরে সামনে এসেছে জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা (এনএফএইচএম)-২০১৯-’২০-র হাড় হিম করা রিপোর্ট। দেখা যাচ্ছে, দেশের বড় ১০টি রাজ্যের মধ্যে ৭টিতেই শিশু ও নারীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা উদ্বেগজনক। এই ৭টি রাজ্যের প্রতিটিতেই শিশু অপুষ্টি বেড়েছে। তিনজন পিছু একজন শিশু পুষ্টির অভাবে ঠিকমতো বাড়তে পারেনি। প্রসূতি মায়েদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৬ জনই ভুগছেন রক্তাল্পতায়। অর্থাৎ পৃথিবীর আলো দেখার আগেই গুরুতর অপুষ্টির শিকার হচ্ছে তাঁদের গর্ভের সন্তান।

কয়েকমাস আগে প্রকাশিত ২০২০ সালের গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স রিপোর্টেও অপুষ্ট ভারতের মর্মান্তিক ছবি স্পষ্ট। ক্ষুধা সূচকে বাংলাদেশ, নেপাল, পাকিস্তানেরও নিচে নেমে গিয়ে ১০৭টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান হয়েছে ৯৪। দেখা গেছে এ দেশে অপুষ্টির মাত্রা আফ্রিকার বহু দারিদ্রপীড়িত দেশের তুলনায় দ্বিগুণ। রাষ্ট্রসংঘের একটি (ইউএন-এফএও) রিপোর্ট বলছে, ভারতের প্রায় ২০ কোটি মানুষের প্রতিদিন দু’বেলা খাবার জোটে না।

এ তো গেল করোনা অতিমারি হানা দেওয়ার আগেকার ছবি। এখন এই অতিমারি বিধ্বস্ত দেশে খাদ্যসঙ্কট যে আরও বহু গুণ তীব্র হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু দেশ পরিচালনার জন্য তো সরকার আছে! দেশের মানুষের অপুষ্টি দূর করতে তারা কী করছে? আগের বছরগুলির কথা যদি বাদও দিই, অতিমারি-লকডাউনে বিপর্যস্ত কোটি কোটি কাজ-খোয়ানো, না-খেতে-পাওয়া পরিবারগুলির কথা আদৌ তারা ভেবেছে কি? ভাবলে কেন্দ্রীয় সরকার কয়েক মাস রেশনে নাম কা ওয়াস্তে কিছু চাল-গম দিয়ে ডিসেম্বর থেকে তা বন্ধ করে দিল কেন? ডিসেম্বর থেকে অভাবে জর্জরিত, অতিমারি ও লকডাউনে বিপর্যস্ত দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের সমস্যাগুলি কি উবে গেছে? সরকার কি সকলের হাতে কাজ তুলে দিতে পেরেছে? নাকি টান পড়েছে দেশের খাদ্যভাণ্ডারে!

কেউ কেউ শেষের যুক্তিটাকেই গুরুত্বপূর্ণ বলে ভাবতে পারেন। মনে হতে পারে, সরকারের পক্ষে কি দেশের মানুষের মুখে মাসের পর মাস ধরে এ ভাবে খাদ্য তুলে দেওয়া সম্ভব! তাঁদের সামনে তুলে ধরা যাক, ভারতের সঞ্চিত খাদ্যভাণ্ডারের চেহারাটা। গত কয়েক বছর ধরেই এ দেশ খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের সমস্ত মানুষকে সারা বছর ভরপেট খাওয়াতে যতটা লাগে, ভারতে ফসলের উৎপাদন হয় তার চেয়ে অনেক গুণ বেশি। ২০১৮-’১৯ সালে ২৮ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন খাদ্যশস্য উৎপন্ন হয়েছে এ দেশে। বর্তমানে গোটা বিশ্বের মধ্যে চাল ও গম উৎপাদনে ভারতের স্থান দ্বিতীয়, মিলেট (জোয়ার, বাজরা, রাগি ইত্যাদি শস্য) উৎপাদনে প্রথম। আপদে-বিপদে অর্থাৎ জরুরি অবস্থায় ব্যবহারের জন্য সরকার ‘বাফার স্টক’-এ মজুত থাকার কথা মোট ৩০৭ লক্ষ টন খাদ্যশস্য, যার মধ্যে প্রয়োজনীয় চালের পরিমাণ ১০২ লক্ষ টন। হিসাবে দেখা যাচ্ছে, গত অক্টোবরের শুরুতে দেশে মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ ৬৩০ লক্ষ টন। শুধু মজুত চালেরই পরিমাণ ১৯৩ লক্ষ টন। অর্থাৎ দেশের গুদামগুলিতে চাল সহ মজুত খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণেরও বেশি। এর ওপর সরকার আবার ধান কেনার কাজ শুরু করেছে। গত নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেনা হয়ে গেছে ২৮৬ লক্ষ টন। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, এ বছর ধান কেনা হবে ৪৯৫ লক্ষ টন। বুঝতে অসুবিধা নেই, পুরনো মজুত খালি করা না গেলে এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য রাখার জায়গা সরকারি গুদামে হবে না।

কী ভাবে খালি করা হবে গুদাম? না, খেতে না পাওয়া মানুষের মধ্যে বিনামূল্যে বা কম দামে খাদ্যশস্য বিলি করা হবে না। বিজেপি সরকার ঘোষণা করেছে, এই বাড়তি খাদ্যশস্য তুলে দেওয়া হবে ভাটিখানা মালিকদের হাতে, ইথানল তৈরির জন্য। মদের অন্যতম উপাদান এই ইথানল নাকি ব্যবহৃত হবে জ্বালানি হিসাবে। ঘোষণা হয়েছে, ভাটিখানা গড়ায় উৎসাহ দিতে শিল্পপতিদের ৪ হাজার ৫৭৩ কোটি টাকা সাহায্যও দেবে মোদি সরকার। অথচ এই বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্যের একটা বড় অংশ ব্যবহার করে অতিমারিতে কাজ হারিয়ে পথে বসা, গরিব, অনাহারী, দেশের বিরাট সংখ্যক মানুষের মুখে খুব সহজেই তো তুলে দেওয়া যেত দু’বেলার পেটভরা খাবার! সে পথে কিন্তু হাঁটল না নরেন্দ্র মোদির বিজেপি সরকার। মানুষের দুর্দশায় কতখানি নির্বিকার হলে তবে কোনও সরকার এমন কাজ করতে পারে!

এ তো স্পষ্ট যে, সরকারি রিপোর্টেই দেশের বড় অংশের মানুষের অপুষ্টির এই যে ভয়াবহ ছবি উঠে এল, সে ছবির কারিগর আর কেউ নয়, খোদ কেন্দ্রের বিজেপি সরকার! এই সরকারই তো অভুক্ত, কঙ্কালসার এই ভারতের নির্মাতা যারা মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে বেচে দেয় মুনাফালোভী মদ-ব্যবসায়ীদের কাছে! এই তা হলে মোদি-শাহদের ঢাক পেটানো দেশপ্রেমের নমুনা! এই প্রধানমন্ত্রীই না দ্বিতীয়বার সরকারে বসে সংসদে প্রবেশ করার সময় দেশের সংবিধানকে সাড়ম্বরে মাথায় ঠেকিয়েছিলেন! আজ কিন্তু সেই সংবিধানের পাতায় লেখা মানুষের ‘খাদ্যের অধিকার’কে দু’পায়ে মাড়িয়ে যেতে বাধছে না তাঁর কিংবা তাঁর সরকারের।

যদিও এ নির্লজ্জ অমানবিকতা নতুন নয়। এর আগেও অনেকবার সরকারি নির্দেশে বাড়তি টন টন খাদ্যশস্য পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয়েছে, তবুও মালিকদের মুনাফার স্বার্থে, পণ্যের দাম পড়ে যাওয়ার ভয়ে সেগুলো বাজারে জোগান দেওয়া হয়নি কিংবা বিনা দামে বা কম দামে গরিব মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয়নি। এমন করলে নাকি অলস হয়ে যাবে খেটে-খাওয়া মানুষ! হায় রে, এঁরাই নাকি নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি!

বাস্তবিকই, পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রটির আসল মালিক মুনাফাবাজ পুঁজিপতি শ্রেণি আর তার রাজনৈতিক ম্যানেজার সরকারগুলি সাধারণ মানুষ সম্পর্কে এমন অবমাননাকর ধারণাই পোষণ করে। সাধারণ মানুষের ভোটে জিতে সরকারে বসে এরা সর্বশক্তি উজাড় করে দেয় মালিক শ্রেণির সেবায়। তাদের মুনাফার ভাণ্ডার ক্রমাগত বাড়িয়ে তোলার নির্লজ্জ অপচেষ্টায় গরিব মানুষের মুখের গ্রাস কেড়ে নিতেও হাত কাঁপে না এদের। দেশের খাদ্যভাণ্ডারের উদ্বৃত্ত শস্য মদের কারবারিদের হাতে তুলে দেওয়ার এই ঘটনা পুঁজিপতি শ্রেণির পেটোয়া সরকারগুলির ঘৃণ্য চেহারা দেশের মানুষের সামনে আরও একবার তুলে ধরল।

মধ্যপ্রদেশে কিশোরী নির্যাতনের প্রতিবাদে মেখলিগঞ্জে মিছিল । ১৮ জানুয়ারি

কৃষকদের ট্র্যাক্টর প্যারেড

একের পাতার পর

কেন্দ্রীয় সরকার করে চলেছে তা যেমন অগণতান্ত্রিক তেমনই অমানবিক। বাড়ি-ঘর ছেড়ে প্রবল শীতের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে এতদিন ধরে অবস্থান করছেন কৃষকরা। প্রাণ হারিয়েছেন ১৪০ জন। তা সত্ত্বেও সরকার নির্বিকার। এই নির্মম সরকারের বিরুদ্ধে কৃষকদের ক্ষোভ তৈরি হলে তার দায় কার? স্বাভাবিক ভাবেই ধৈর্যচ্যুত হয়ে এ দিন আবেগ-তাড়িত কৃষকদের একাংশ নির্দিষ্ট কর্মসূচির বাইরে গিয়ে রাজধানীর মধ্যে ঢুকে পড়লে পুলিশ তাঁদের নির্মম ভাবে লাঠিপেটা করেছে, টিয়ার গ্যাস এবং জল কামান চালিয়েছে, যা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সংযুক্ত কিসান মোর্চার নেতৃত্ব এই পুলিশি অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করেন। একই সাথে তাঁরা বলেন, কৃষকদের এমন কিছু করা উচিত নয় যাতে আন্দোলন ভাঙতে শাসক বিজেপির সুবিধা হয়ে যায়। তাঁরা আন্দোলনের সংহতি আরও দৃঢ় করার আহ্বান জানান।

কিসান প্যারেডের সমর্থনে সারা দেশ জুড়ে রাজ্যপালের দপ্তরে এদিন বিক্ষোভ দেখায় এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)। দেশের শত শত জায়গায় কৃষকরা এ দিন ট্র্যাক্টর মিছিল করে মূল আন্দোলনের প্রতি সংহতি জানান। কলকাতায় শিয়ালদহ থেকে দলের উদ্যোগে এক বিশাল মিছিল ট্র্যাক্টর নিয়ে ধর্মতলায় গিয়ে বিক্ষোভ দেখায়। সেখানে কৃষি আইনের কপিতে আগুন দেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য। বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর, তমলুক, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, কৃষ্ণনগর, বাঁকুড়া, জয়নগর, কুলতলি, মথুরাপুর প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ শহরে কোথাও ট্র্যাক্টর মিছিল, কোথাও বাইক মিছিল, কোথাও সাইকেল মিছিল হয়। সর্বত্রই কৃষকদের মধ্যে গভীর আবেগ লক্ষ করা যায়।

গভীর রাত পর্যন্ত দিল্লিতে কৃষকদের ট্র্যাক্টর মিছিল চলে। কৃষক নেতারা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অবিলম্বে জনবিরোধী কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ বিল-২০২০ প্রত্যাহার করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, দাবি আদায় না হলে শান্তিপূর্ণ আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার নেবে।

কলকাতায় রাজভবন অভিযান। ২৬ জানুয়ারি

দক্ষিণ ২৪ পরগণার কুলতলিতে ট্র্যাক্টর সহ মোটর সাইকেল র‍্যালি। ২৬ জানুয়ারি

কলকাতায় ট্র্যাক্টর মিছিল। ২৬ জানুয়ারি

কৃষক আন্দোলন ও স্বৈরাচারী সরকার

তিনের পাতার পর

সরকারকে কর্পোরেটদের কাছ থেকেই কিনতে হবে। বলা বাহুল্য এর জন্য মিলিটারি বাজেট বাড়বে এবং পাল্লা দিয়ে বাড়বে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা।

চুক্তি চাষ ঃ কৃষক মারা কল

একদিকে কৃষকদের চাষের সার-বীজ-কীটনাশক-বিদ্যুৎ ইত্যাদির জন্য কর্পোরেটদের সীমাহীন শোষণ, অন্য দিকে উৎপাদিত ফসল বিক্রির জন্য কর্পোরেট মুখাপেক্ষী হতে বাধ্য হওয়ার মতো পরিস্থিতিতে চাষির আরও বেশি ঋণগ্রস্ত হওয়া ছাড়া পথ থাকবে না। আর ফসলের দাম না পাওয়া ঋণগ্রস্ত এই চাষিদের বোঝানো যাবে, ‘তোমার পছন্দের ফসল চাষ করে তো দাম পাচ্ছো না, কোম্পানির পছন্দের ফসল চুক্তিতে চাষ করো, ফসল ওঠার পর সুনিশ্চিত দাম পাবে’। তার জন্য আনা হয়েছে তৃতীয় একটি আইন-ফাঁদ— ‘ফসলের দাম নিশ্চিতকরণ এবং কৃষি পরিবারের ক্ষেত্রে চাষির (ক্ষমতায়ন ও সুরক্ষা) আইন’। নাম তার যা-ই হোক না কেন সহজ কথায় এটা হল চুক্তি চাষের আইন। ‘নিশ্চিতকরণ’, ‘ক্ষমতায়ন’ বা ‘সুরক্ষা’— যে শব্দই ব্যবহার হোক, এটা ‘কৃষক মারা কল’ ছাড়া কিছু নয়।

চুক্তি চাষের আইনে বলা হয়েছে, চুক্তি হবে এক থেকে পাঁচ বছরের জন্য। চুক্তির বিষয় থাকবে উৎপাদিত পণ্য সরবরাহের সময়, পণ্যের গুণাগুণ, শ্রেণি, মান, দাম এবং এই ধরনের অন্যান্য বিষয়। এই গুণাগুণের সঙ্গে যুক্ত থাকবে ফসলে প্রয়োগ করা কীটনাশক ছত্রাকনাশকের অবশিষ্টাংশের পরিমাণ, খাদ্য সুরক্ষার মান সহ আরও বেশ কিছু বিষয়।

চুক্তি চাষের আইনেও চুক্তিকারী ক্রেতা চুক্তি করা কৃষিপণ্য যত খুশি মজুত করতে পারবে এবং সেক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক পণ্য আইনে উল্লেখিত কোনও ধারা বা সরকারি কোনও অর্ডার বা অন্য কোনও আইন সেই সব পণ্য মজুতের ঊর্ধ্বসীমার ব্যাপারে বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। এরপরও কি বলা যাবে যে এই আইন কর্পোরেটের স্বার্থে নয়?

চুক্তি এক বছর বা পাঁচ বছরের হোক, চুক্তিপত্রে ফসলের দাম ঠিক করা হবে প্রথম বছরেই। যদি পঞ্চম বর্ষে বাজারে ফসলের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়, তা হলে চাষিকে চুক্তিকারী ক্রেতা দ্বিগুণ দাম নিশ্চয়ই দেবে না। কিন্তু বাজারে দাম কমে গেলে চুক্তি ভঙ্গ করতে তাদের এতটুকু সময় লাগবে না। চুক্তি ভঙ্গ করলে অবশ্য বিচারের জন্য সাব-ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে অভিযোগ করা যাবে। কিন্তু চাষি কি ফসল ঘরে রেখে পেটে গামছা বেঁধে মহকুমা অফিস এবং জেলাশাসকের অফিসে মাসের পর মাস দৌড়াদৌড়ি করতে পারবে? অন্য দিকে চাষি চুক্তি ভঙ্গ করলে কর্পোরেট হাউস চাষিকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে বিন্দুমাত্র ছাড়বে না। আমাদের দেশের আমলাতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ক’জন আমলা চাষির পক্ষে দাঁড়াবে?

মোদিজি বুক ফুলিয়ে বলছেন, “বিরোধীরা চাষিদের ভুল বোঝাচ্ছে। চুক্তি হবে ফসলের বেচাকেনা নিয়ে, তা হলে ফসলের ক্রেতা কী করে জমি ছিনিয়ে নেবে?” নরেন্দ্র মোদি কি জানেন না, কী করে চাষিরা ভূমিহীন হয়ে যায়? তারা কি কারও সাথে ভূমিহীন হওয়ার জন্য চুক্তি করে ভূমিহীন হয়েছে? তবুও ভূমিহীন হয় কেন তা জানতে তো বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না!

ফলে চুক্তি চাষে চাষি লাভবান হবে বলে যে জোর প্রচার প্রধানমন্ত্রী করে চলেছেন তা উপরোক্ত অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক কথাগুলিকে বাদ দিয়েই। নরেন্দ্র মোদির বক্তব্য, “কর্পোরেটকে অন্তর থেকে বিশ্বাস করো।” এই কর্পোরেটরাই ব্যাঙ্ক থেকে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে বছরের পর বছর শোধ না করে ফেলে রাখে। মুনাফার পাহাড় জমিয়ে বিশ্বের সেরা ধনীদের তালিকায় তাদের নাম ওঠা সত্ত্বেও ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণ শোধ করার বিন্দুমাত্র আগ্রহ তারা দেখায় না। তাদের বন্ধু সরকার সেই সব ঋণ মকুব করে দেয়। দেশের দরিদ্র জনসাধারণকে তার বোঝা বইতে হয়। কেউ কেউ সেসব শোধ না করে দেশ ছেড়ে চলেও যায়। মুনাফালোভী সেইসব কর্পোরেট হাঙররা কি চাষিকে ঠকাবে না? হাত-পা বেঁধে দেশের কৃষকদের সেই মুনাফা-শিকারি হাঙরদের মুখে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। নরেন্দ্র মোদির মতো তাকতদার প্রধানমন্ত্রীও যাদের দেশে ফেরাতে পারছেন না, সেই কর্পোরেটের সঙ্গে লড়বে হাত-পা বাঁধা হতদরিদ্র চাষি!

চুক্তি চাষের আইনে রয়েছে আরও একটি কালা বিধান। ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই কৃষি-আইনে বাস্তবে রাজ্য সরকারের হাতে কোনও ক্ষমতাই থাকবে না। আইনের চতুর্থ অধ্যায়ে ১৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, কেন্দ্রীয় সরকার যেমন প্রয়োজন মনে করবে, বিভিন্ন সময়ে রাজ্য সরকারকে নীতি-নির্ধারণের তেমন নির্দেশ দেবে এবং রাজ্য সরকারগুলি সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকবে ।

শুধু তাই নয়, এই আইন বা নির্দেশ সংক্রান্ত বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, চুক্তিচাষের রেজিস্ট্রেশন অথরিটি, চুক্তি চাষে বিবাদ মেটানোর জন্য গঠিত মহকুমা কর্তৃপক্ষ বা তার দ্বারা গঠিত কোনও কর্তৃপক্ষ বা কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনও রকম মামলা বা আইনি পদক্ষেপ নেওয়া যাবে না। এখানেই শেষ নয়। কোনও দেওয়ানি আদালতের ক্ষমতা থাকবে না এই সংক্রান্ত বিবাদে কোনও মামলা গ্রহণ করার বা ইনজাংকশন জারি করার। চাষি এবং ক্রেতার মধ্যে বিবাদ মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের মর্জি এবং আমলাদের হাতে সব কিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এই আইনে।

এই তিনটি কালা কৃষি-আইনের সাথে সরকারের বর্তমান গণবণ্টন ব্যবস্থার নীতিকে একসঙ্গে নিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, নতুন এই কৃষি আইনগুলির উদ্দেশ্য হল, খাদ্য সহ সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যকে পুরোপুরি বহুজাতিক পুঁজির হাতে তুলে দেওয়া। তার ফলে রেশন ব্যবস্থা, যা কেন্দ্রীয় সরকার প্রায় তুলে দিতেই বসেছে, তা আরও ভেঙে পড়বে। সেই সুযোগে কর্পোরেটরা একদিকে জলের দরে কৃষকের ফসল কিনবে এবং অন্য দিকে অগ্নিমূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করে যথেচ্ছ মুনাফা লুটবে। আজ এর জ্বালা বুঝতে পারছেন কৃষকরা, বুঝছেন সাধারণ মানুষও। তাই কোনও মিষ্টি কথায় কৃষকদের অন্য কিছু বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না, সাধারণ মানুষকেও বিভ্রান্ত করা যাচ্ছে না। (চলবে)

মধ্যপ্রদেশের গুনায় এআইকেকেএমএসের অবস্থানে বক্তব্য রাখছেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক মনীশ শ্রীবাস্তব। ১১ জানুয়ারি

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21

২১ জানুয়ারি মহান লেনিন স্মরণ দিবসে

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপকার মহান লেনিনের প্রয়াণ দিবস ২১ জানুয়ারি শিবপুর পার্টি সেন্টারে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের শ্রদ্ধার্ঘ্য (বাঁদিকে)। কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

২৬ জানুয়ারি কৃষক প্রজাতন্ত্র দিবসে ট্রাক্টর ও বাইক মিছিল

বিষ্ণুপুর, বাঁকুড়া

কৃষ্ণনগর, নদিয়া

শিলিগুড়ি, দার্জিলিং

চা-শ্রমিক বিক্ষোভ উত্তরবঙ্গে

দিল্লির ঐতিহাসিক কৃষক আন্দোলনের সমর্থনে এবং চা বাগান শ্রমিকদের অবিলম্বে মিনিমাম ওয়েজ চালুর দাবিতে ২০ জানুয়ারি বীরপাড়া এএলসি অফিসে এআইইউটিইউসি অনুমোদিত এনবিটিপিইইউ বীরপাড়া-মাদারিহাট ইউনিটের পক্ষ থেকে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ডেপুটেশন দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বহু দফায় বৈঠকের পরও মিনিমাম ওয়েজ অ্যাডভাইজার কমিটি মিনিমাম ওয়েজ নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোনও সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেনি। বরং উল্টে ইন্টারিম দেওয়ার ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার ও মালিকপক্ষের টালবাহানার বিরুদ্ধে ২৩ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার ডিএম দপ্তরে বিক্ষোভ দেখানো হয়।

ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন কেন্দ্রীয় অফিস সম্পাদক কমরেডস মৃণাল কান্তি রায়, মনোজ মুণ্ডা, সুভাষ বড়াইক, বিপ্তী বারা প্রমুখ। ১৯ জানুয়ারি মুঝনাই চা বাগানে বিক্ষোভ দেখান। নেতৃত্ব দেন কমরেডস মনোজ মুণ্ডা ও ছোটেলাল তাঁতি।

দিল্লির কৃষক আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে এস ইউ সি আই (সি) কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ লোকাল কমিটির উদ্যোগে ২০ জানুয়ারি তুফানগঞ্জ শহর থেকে দেওচড়াই বাজার পর্যন্ত ১৫ কিলোমিটার কিসান জাঠা সংগঠিত হয়। নেতৃত্ব দেন কমরেডস রুহুল আমিন, দেবেন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ।

গুলবর্গা, কর্নাটক। ২৩ জানুয়ারি

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com